১৯৮৪

জর্জ অরওয়েল
অনুবাদ: জাওয়াদ উল আলম

১৯৮৪

জর্জ অরওয়েল

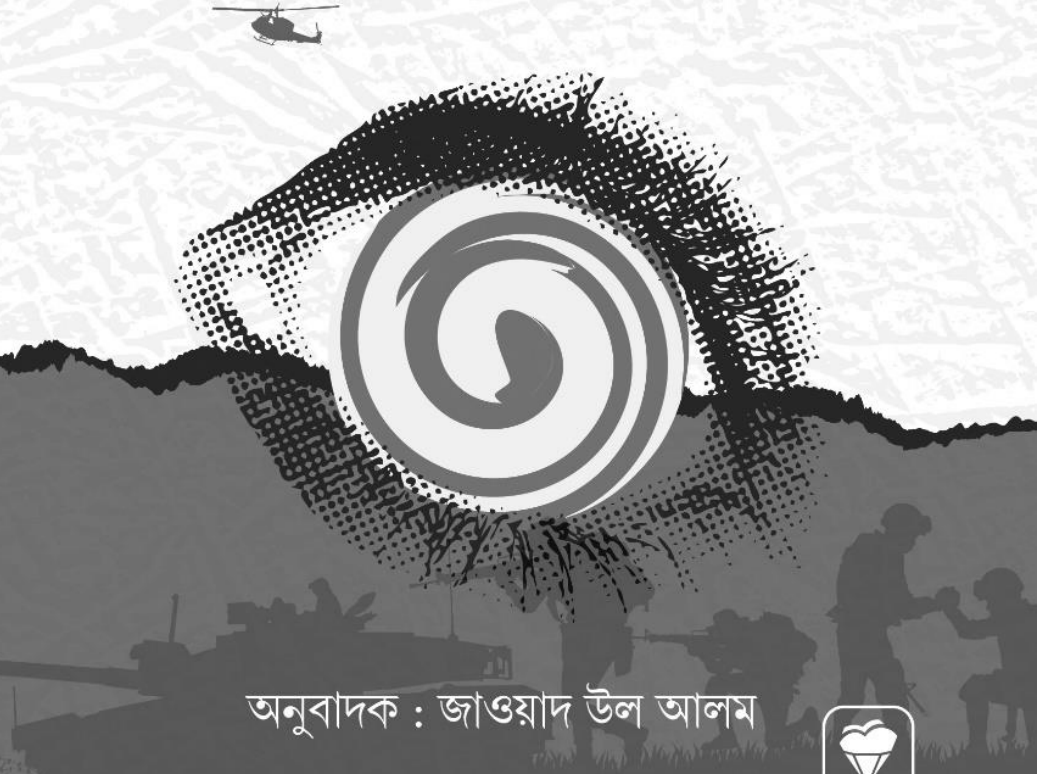

অনুবাদক : জাওয়াদ উল আলম

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৫

প্রচ্ছদ : আহমাদ বোরহান
অক্ষর বিন্যাস : রওনাকুর রহমান

প্রকাশক : জিয়াউল হাসান নিয়াজ
প্রকাশনী : প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স
ঠিকানা : ৩৮ বাংলাবাজার ঢাকা
বইমেলা পরিবেশক : বইমই

ফোন : ০১৭৯৮৬৫৯১৪৬
হোয়াটসঅ্যাপ : ০১৭৯৮৬৫৯১৪৬
অনলাইন পরিবেশক : **rokomari.com**
মুদ্রণ : মক্কা প্রিন্টার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ISBN: 978-984-99327-6-5

মূল্য : ৫০০/-

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের
কোনে অংশেরই কোনোরূপ পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম খণ্ড

১

এপ্রিলের ঝকঝকে হিম ধরা দিন। ঘড়ির কাটা তেরোটার ঘরে হাতুড়ি পেটা করছে। উইন্সটন স্মিথ বিধ্বংসী হিমশীতল ঠাণ্ডা বাতাস থেকে বাঁচতে চিবুকটা বুকের যতটা সম্ভব ভেতরে নিয়ে চট করে ভিক্টরি ম্যানশনের কাঁচের দরজা দিয়ে ঢুকে গেল। কিন্তু উচ্ছন্ন বাতাস তার গতির মুখে বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে এক ঝটকায় ধুলো উড়িয়ে দিল অন্দরমহলে।

হলওয়ে জুড়ে সেদ্ধ বাঁধাকপি আর পুরোনো স্যাঁতস্যাঁতে মাদুরের গন্ধ বিরাজমান। একদম শেষ মাথায়, অন্দরমহলের সাথে বেমানান দৈত্যাকার একটি রঙচটা পোস্টারে দেখা যাচ্ছে এক মুখ, যা দৈর্ঘ্যে কম করে হলেও এক মিটার চওড়া হবে। ছবিতে থাকা লোকটার বয়স পঁয়তাল্লিশের কোঠায়, ঠোঁটের ওপর ঘন গোঁফ আর চেহারা একটু কাঠখোট্টা হলেও বেশ আকর্ষণীয়।

উইন্সটন ধীরপায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। লিফটের আশা করে লাভ নেই। কপাল খুব ভালো থাকলে ওই জিনিস কদাচিৎ কাজ করে আর আজ তো দিনের বেলাতেই বিদ্যুৎ নেই। *ঘৃণা সপ্তাহের* প্রস্তুতি হিসেবে অর্থনীতির চাকা একটু দ্রুত ঘোরানোর জন্য বিদ্যুৎ সাশ্রয় করার লক্ষ্যে এই ব্যবস্থা।

উইনস্টনের ফ্ল্যাটটি সাত তলায়। ডান পায়ের গোড়ালির উপর ঘা নিয়ে উনচল্লিশে পা রাখা উইন্সটন ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলেছে নিজের ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে। তাকে মুহুর্মুহু থেমে বিশ্রাম নিতে হয়। প্রতি তলায় লিফটের উলটো দিকে সেই ঢাউস পোস্টার থেকে মুখটি চোখ পাকিয়ে যেন তাকিয়ে আছে। এই পোস্টারগুলো দেখলেই মনে হয়, সিঁড়ি ভেঙে ওঠার সময় আপনি কী করছেন তার উপর কড়া নজরদারি রাখছে মুখাবয়বটি। তার ওপর, নিচে ক্যাপশনে লেখা, **'বিগ ব্রাদার তোমায় দেখছে।'**

ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে ভরাট তবে স্পষ্ট গলায় কেউ একজন কিছু জিনিসের একটি তালিকা পড়ে যাচ্ছে। জিনিসগুলো মূলত লোহা উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। আওয়াজটি আসছে ডান দিকের দেওয়ালে লাগানো আয়নার মতো দেখতে আয়তাকার ধাতব ফলক থেকে। উইন্সটন সুইচ ঘুরিয়ে আওয়াজ একদম কমিয়ে দিল। তবে শব্দগুলো ঠিকই বোঝা যাচ্ছে। যন্ত্রটিকে সাধারণত

টেলিস্ক্রিন বলা হয়ে থাকে, চাইলেই এর আওয়াজ কমানো যায় তবে পুরোপুরি বন্ধ করা যায় না।

সে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। ক্ষুদ্রকায় জীর্ণ দেহ নীলরঙা আলখাল্লায় যেন আরো এইটুকু লাগছে। আলখাল্লাটি মূলত পার্টির ইউনিফর্ম। তার চুলগুলো উজ্জ্বল সাদা, চেহারা অরুণ রঙের, ত্বক কমদামি সাবান আর ভোতা রেজরব্লেডের বদৌলতে খসখসে হয়ে আছে, সাথে সদ্য সমাপ্ত শীতের প্রকোপ তো আছেই।

জানালার বন্ধ শার্সির ওপারে শহরটা শীতে জর্জরিত মনে হয়। রাস্তায় তাকালেই দেখা যায়, থেকে থেকে ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে ধুলোবালি ও টুকরো সব কাগজের দল। যদিও নীল আকাশে সূর্য জ্বলজ্বল করছে, তাও দেওয়ালে সাঁটা পোস্টারগুলো ছাড়া বাকি কিছুই দেখে রঙিন বলে মনে হয় না। কালো গোঁফের মানুষটা প্রতিটি কোনায় কোনায় যেন প্রভূত্বের সূচক হিসেবে বিরাজমান। তেমনই এক পোস্টার তার ঠিক মুখোমুখি লাগানো। 'বিগ ব্রাদার তোমায় দেখছে,' ক্যাপশনে লেখা। কালো চোখগুলো যেন সরাসরি দেখছে উইন্সটনের ভেতরকার আত্মাকে।

একদম নিচে রাস্তায় সাঁটা একটি পোস্টারের কোনা ছেঁড়া, বাতাসে ফড়ফড় করে উড়ছে; তাতেই মুহুর্মুহু দেখা যাচ্ছে 'ইংসক' শব্দটি। ওই দূরে সহসা এক হেলিকপ্টার উড়তে উড়তে দালানকোঠার কাছে নেমে এলো, ওখানেই সেকেণ্ড খানেক হাওয়ায় ভেসে রইল বোলতার মতো। তারপর আবারও জোরে একটি বাঁক নিয়ে চলে গেল অন্য জায়গায়। ওটা ছিল পুলিশের টহলদারি হেলিকপ্টার। তারা মানুষের বাড়ির জানালায় জানালায় গিয়ে নজরদারি করে। যদিও এসব টহলের ধানাইপানাই অর্থহীন। একমাত্র থট পুলিশকে নিয়েই যত চিন্তা করতে হয় সবার।

উইন্সটনের পেছনে এখনো টেলিস্ক্রিনে আওয়াজটা লোহার উৎপাদন ও নবম তিন-বছর মেয়াদী পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন নিয়ে বকবক করে চলেছে। টেলিস্ক্রিনটি একইসাথে শব্দ গ্রহণ ও প্রেরণের ক্ষমতা রাখে। এই যেমন, উইন্সটনের মুখ দিয়ে যদি এখন কোনো ফিসফাসও বেরিয়ে আসে, তাও

যন্ত্রটি শুনতে সক্ষম। শুধু তাই না, এর নির্ধারিত দৃষ্টিসীমার মধ্যে পড়লে মানুষের কথা শোনার পাশাপাশি যন্ত্রটি সার্বক্ষণিক নজরদারিও করে।

অবশ্য সরকার যে কখন, কার দিকে চোখ রাখছে তা বোঝার কোনো উপায় নেই। থট পুলিশ যে কোন সিস্টেমে, কতবার করে ঢুকে একটা মানুষকে খতিয়ে দেখে তা অনুমানের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কেউ কেউ তো ভাবে, তারা সর্বক্ষণ তাদের উপর নজর রাখে। তবে এটা সত্যি যে, তারা চাইলে যেকোনো সময় যে কারো ব্যক্তিগত ডেরায় প্রবেশ করার ক্ষমতা রাখে। মুখ দিয়ে বের হওয়া প্রতিটি শব্দ শোনা হচ্ছে, অন্ধকার বাদ দিয়ে প্রতিটি কার্যক্রম দেখা হচ্ছে— এই একটি ধারণা কালক্রমে এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাপনের অতি স্বাভাবিক এক অংশ হয়ে উঠেছে।

উইন্সটন টেলিস্ক্রিনকে পিঠ দেখিয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। এভাবেই ভালো, নিরাপদ বলে মনে হয় তার। যদিও সে জানে যে, চাইলে পিঠ দেখেও অনেক কিছু পড়া যায়। এখান থেকে 'সত্য মন্ত্রণালয়' প্রায় এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ওখানেই কাজ করে উইন্সটন। নোংরা দৃশ্যপটে মন্ত্রণালয়ের বিশালাকার সাদা দালানটি যেন দাম্ভিকতার সাথে আকাশ ছুঁতে চায়।

উইন্সটন ম্লান মুখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে শহরের দিকে। এটাই হলো লন্ডন, ওশেনিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম জনবহুল প্রদেশ— এয়ারস্ট্রিপ ওয়ানের রাজধানী। সে ছোটোবেলার স্মৃতি হাতড়ে লন্ডনের এই রূপটাকে খুঁজে চলে। আগেও কি সব এমনই ছিল? উনিশ শতকের জীর্ণ সব বাড়ি যার দেহগুলো কাঠের পাটাতনে কোনোরকমে টিকে আছে, জানালায় লাগানো কার্ডবোর্ড আর ছাদগুলো পুরোনো সব টিনে ঢাকা? যেখানে বাগানের দেওয়ালগুলো প্রায় ঝুলে পড়েছে সব দিকে? বোমার আঘাতে জর্জর জায়গাগুলোয় পলেস্তারার ধুলো যত্রতত্র উড়ে চলেছে? ইট-পাথরের ধ্বংসাবশেষের ফাঁক গলে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে কুঞ্জলতা? আর বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত একটু বড়ো এলাকাগুলোয় বেড়ে উঠেছে মুরগির ঘরের মতো সব মানব-বসতি?

কিন্তু শত চেষ্টা করেও কোনো লাভ হয় না। ঝাপসা স্মৃতিতে কিছু উজ্জ্বল আলো ঝলকে যায় এদিক ওদিক; যার সবটাই অর্থহীন।

এই পুরো জরাজীর্ণ দৃশ্যপটে সত্য মন্ত্রণালয় হলো একদম আলাদা একটি কাঠামো। ওশেনিয়ার দাপ্তরিক ভাষা নিউস্পিকের মাধ্যমে এই মন্ত্রণালয়কে ডাকা হয় 'মিনিট্রু'। পিরামিডের মতো দেখতে সাদা কংক্রিটে চকচকে এই কাঠামো এক এক তলা করে আকাশের দিকে উঠে গেছে পুরো তিনশ মিটার অবধি। উইন্সটন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকেই এর সাদা গায়ে কেতাদুরস্ত শৈলীতে লেখা পার্টির তিন স্লোগানগুলো পড়তে পারছে-

যুদ্ধই শান্তি
স্বাধীনতাই দাসত্ব
অজ্ঞতাই শক্তি

বলা হয়ে থাকে, কেবল সত্য মন্ত্রণালয়ে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত একেবারে কম করে হলেও প্রায় তিন হাজারের মতো রুম আছে। লন্ডনে এমন দেখতে আরো তিনটি দালান রয়েছে। চারদিকে এগুলো এমন দৈত্যাকারে বিরাজমান যে, ভিক্টরি ম্যানশনের ছাদে দাঁড়ালে সবগুলোকে একসাথে দেখতে পাওয়া যায়। এই চারটা দালানে মূলত চার মন্ত্রণালয় অবস্থিত, যাদের কাঁধে পা দিয়ে চলে এই সরকার। সত্য মন্ত্রণালয় খবর, বিনোদন, শিক্ষা ও চিত্রকলার বিষয়গুলো দেখে। শান্তি মন্ত্রণালয় কাজ করে যুদ্ধ নিয়ে। ভালোবাসা মন্ত্রণালয় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করে। আর প্রাচুর্য মন্ত্রণালয় খেয়াল রাখে অর্থনৈতিক দিকের। নিউস্পিকের ভাষায় এদের বলা হয়- মিনিট্রু, মিনিপ্যাক্স, মিনিলাভ এবং মিনিপ্ল্যান্টি।

এই চারটির মধ্যে ভালোবাসা মন্ত্রণালয় হলো সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। মন্ত্রণালয়ের গোটা দালান জুড়ে যদি একটি জানালা থাকত! উইন্সটন কখনো ভালোবাসা মন্ত্রণালয়ে যায়নি, এমনকি এর আধ কিলোমিটার পরিসীমার মাঝেও কখনো পা মাড়ায়নি। তাছাড়া, জায়গাটাতে ঢোকাও অসম্ভব। একমাত্র জরুরি দাপ্তরিক কাজে সেই দালানে ঢোকা যায়, তাও অনেক কসরত করতে হয়। কাঁটাতারের বেড়াজাল, ইস্পাতের দরজা, লুকানো সব মেশিন-গানের নীড়... এমনকি সীমানা প্রাচীরের বাইরের রাস্তাতেও ঘোরাফেরা করে কালো উর্দি পরা গরিলা-চেহারার সব প্রহরী, যাদের হাতে থাকে ইয়া মোটা মোটা একেকটা লাঠি।